মেহেরপুরে সরকারি যাকাত ফান্ড থেকে যাকাতের চেক বিতরণ

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য বাছাইকৃত স্থায়ী যাকাত গ্রহীতাদের মধ্যে সরকারি যাকাত ফান্ডের অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। কর্মহীন, দুঃস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদের সহায়তার লক্ষ্যে এ অর্থ প্রদান করা হয়।

এ বছর মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সরকারি যাকাত ফান্ড থেকে ৩২ জনকে প্রতিজন ৬ হাজার টাকা করে মোট ১ লাখ ৯২ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ মার্চ) সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে যাকাতের চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. এ. কে. এম. আবু সাঈদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মুনীর, জেলা সমাজসেবা (রেজি.) অফিসার কাজী আবুল মনসুর, সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. আনিসুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে প্রস্তাবিত হজ্ব যাত্রীদের ইফতার ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরে তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষ্যে প্রস্তাবিত হজ্ব যাত্রীদের নিয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২২ মার্চ) বিকেল তিনটার দিকে শহরের মল্লিকপাড়া আঞ্চলিক

অফিসে এ প্রস্তাবিত হজ্ব যাত্রীদের নিয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

তাতাসা হজ্ব ও মরাহ কাফেলার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মোঃ মাহবুবু উল আলম।

ভেড়ামারা ল্যাব এইড সেন্টারে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাংবাদিক শাহজামালের সঞ্চালনায় বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার উপদেষ্টা ও চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মোঃ খালিদ সাইফুল্লাহ ও তাতাসা হজ্ব ও ওমরাহ কাফেলার উপদেষ্টা এবং নওদাপাড়া জামে মসজিদ খতিব হাফেজ মাওলানা আবুল হাশেম।

আরবি ভাষার উৎস, জন্ম ও ক্রমবিকাশ- এম এ এস ইমন

তাদের বাণিজ্যপথের মাধ্যমে নাবাতিয়ান আরবি ভাষা ও এই রূপান্তরিত আরামাইক লিপি আরব উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে হিজাজ (বর্তমানে ইসলামের পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনা এই হিজাজ অঞ্চলে অবস্থিত) হয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

যা-ই হোক, প্রথমে নাবাতিয়ান বাণিজ্যের প্রভাবে এবং পরে ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে সারা আরব উপদ্বীপেই ধীরে ধীরে আরবি ভাষা ছড়িয়ে পড়ে, এবং আগের প্রাচীন ভাষাগুলোর ব্যবহার কমতে কমতে এককালে হারিয়ে যায়। প্রধান ব্যতিক্রম থেকে যায় নাবাতিয়ান রাজ্য থেকে দূরতম প্রান্তে অবস্থিত ইয়েমেন ও ওমান সীমান্তে হাজরামাউত ও জুফার অঞ্চল, যেখানকার আঞ্চলিক ভাষা তখনও আরবি ছিল না।

৩২৯ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্কের ১২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে আন-নামারাতে আরেকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। এই শিলালিপির ভাষাটি প্রায় শাস্ত্রীয় আরবির মতোই। যদিও এই শিলালিপিগুলো স্পষ্টতই

আরবি ভাষায় লেখা, এগুলো আরবি লিপিতে লেখা নয়, বরং এটি নাবাতিয়ান লিপি, যা আরামাইক লিপি থেকে এসেছে।

কিন্তু কিছু শিলালিপি খ্রিষ্টীয় ৪র্থ এবং ৫ম শতাব্দীরও রয়েছে, যেগুলো আরবি ভাষার মতো একটি লিপিতে লেখা। সাধারণত মনে করা হয় যে, আরবি লিপি নাবাতিয়ান লিপি থেকে বিকশিত হয়েছে, এবং এই শিলালিপিগুলো একটি স্ক্রিপ্ট বা লিপিতে লেখা হতে পারে যেটি এই দুটির মধ্যে হতে পারে। এই শিলালিপিগুলো মূলত উত্তর আরবের ছিল।

অন্যদিকে, দক্ষিণ আরবীয়রা তাদের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়কে লিপিবদ্ধ করার জন্য যে ধরনের উপাদান ব্যবহার করত, তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধরনের শিলালিপির প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর বয়স খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম ও নবম শতক।

এই লিপিগুলো লেখা হতো একবার বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, পরের লাইন ডান থেকে বাঁ দিকে। এই লিপিগুলো থেকে জানা যায় যে, দক্ষিণ আরবীয় বা মিনীয়-সাবিয়ান ভাষার (হিময়ারাইট নামেও পরিচিত) বর্ণমালাতে ২৯টি অক্ষর ছিল যা আধুনিক আরবি বর্ণমালাতেও দেখা যায়। বর্ণগুলোর আকার ছিল অনেকটা কাঁটাওয়ালা আঁকশি বা কুড়ুলের মতো।

এগুলো এসেছিল সিনিয় বর্ণমালা থেকে, যেটি আবার ফিনিশিয় ও মিশরীয় বর্ণমালার পূর্বসূরির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত সুসামঞ্জস্য অক্ষরগুলো একটি দীর্ঘ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

অন্যান্য সেমিটিয় বর্ণমালার মতো এর বর্ণমালাতেও কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণেরই অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ্য পদ গঠনে, ক্রিয়ার ধাতুরূপ, ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ও শব্দভাণ্ডারের বেশ কিছু ক্ষেত্রে আক্কাদিয়ান (অ্যাসিরো-ব্যাবিলনিয়ান) ও ইথিওপীয় ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার মিল লক্ষ্য করা যায়।

আবার, এই ভাষার মধ্যে ভাঙা-ভাঙা বহুবচন লক্ষ্য করা যায় যা উত্তর আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করে। আক্কাদিয়ান, দক্ষিণ আরবীয় ও ইথিওপীয় ভাষা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো সেমিটিক ভাষার বৈশিষ্ট্যকেই প্রতিফলিত করেছে। ইয়েমেন সংস্কৃতি ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আরবীয় ভাষার বিলুপ্তি ঘটে, আর এই স্থান দখল করে নেয় উত্তর আরবীয় ভাষা। উত্তর আরবে ‘উকাজ’-এর মতো সাহিত্য মেলা, কাবায় বার্ষিক হজ্বযাত্রা ও মক্কার সঙ্গে বাণিজ্যিক

সম্পর্ক এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

আরবে ইসলাম আগমনের আগে, উপদ্বীপের চারপাশে আরবি ভাষার অসংখ্য উপভাষা প্রচলিত ছিল। তবে ‘কোইন’ নামে একটি সাধারণ সাহিত্যিক ভাষাও ছিল কবিতার জন্য, যা বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ব্যবহৃত হতো। সাহিত্যিক ভাষা কোইনে লেখা কবিতার অংশগুলো ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী আরবি ভাষার প্রাচীনতম উদাহরণ।

ধ্রুপদী আরবি সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো ‘মুআল্লকাত’ নামক কবিতা সংকলন। আরব পণ্ডিতদের মতে, ইসলামি যুগের আগে তদানীন্তন প্রাক-ইসলামি কবিদের লেখা সেরা সাতটি দীর্ঘ কবিতা সংগ্রহ করে একে একত্রে সংকলন করা হয়। এই প্রাক-ইসলামি কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ইমরুল-কায়েস, যিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন। পরবর্তী যুগে আরবি ব্যাকরণবিদরা যে ভাষাকে ‘আরাবিয়্যা’ নাম দিয়ে প্রমিত আরবি হিসেবে গ্রহণ করেন, তার প্রথম নিদর্শন এই কবিতাগুলো। কুরআন পাঠে যে আরবি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ ব্যবহার হয়, সেটিও এই প্রমিত আরবির উদাহরণ।

তাই বলা যায়, ধ্রুপদী আরবি, যেটি ৬ষ্ঠ শতক থেকে প্রচলিত হয়, সেটাতেই পবিত্র কুরআন লেখা হয়েছে। কুরআন লেখার সময় ধ্রুপদী আরবি ভাষার সাতটি উপভাষা ছিল, যার সবকটিতেই কুরআন লেখা হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ সংস্করণটি সেই মানদণ্ড হয়ে উঠেছে, যার উপর ভিত্তি করে আজকের কুরআন পঠিত হয়।

পার্থক্যগুলো উচ্চারণে; শব্দভান্ডার বা ব্যাকরণে নয়। কুরআনের আরবি প্রাক-ইসলামিক ধ্রুপদী আরবি কবিতার অনুরূপ, তবে সম্পূর্ণভাবে নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের শুরু থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত, ইসলামি সাম্রাজ্যের বিজয় আরবি ভাষাকে নতুন নতুন দূরবর্তী দেশে ছড়িয়ে দেয়। ইসলামি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পর আরবি ভাষাকে মানসম্মত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কারণ, বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ভাষা ব্যবহার শুরু করেছিল। যার কারণে একে আরও ব্যবহারিক করা হয়, নতুন শব্দভাণ্ডার তৈরি করা হয়, এবং গদ্যের ব্যাকরণ ও গদ্যশৈলী প্রমিত করা হয়।

সব সেমিটিক ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যাঞ্জনবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দমূল। সাধারণত তিনটি ব্যাঞ্জনবর্ণ নিয়ে গঠিত হয় একটি মূল শব্দ, যাদের একটি মূল অর্থ থাকে। তারপর স্বরবর্ণ যোগ করে বা উপসর্গ, মধ্যসর্গ আর অন্তঃপ্রত্যয় বসিয়ে এই মূলকে বিভিন্নভাবে

দীর্ঘস্থায়ী মুসলিম সংস্কৃতি ও আরবি ভাষার উপস্থিতির কারণে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, কাতালান এবং সিসিলিয়ান শব্দভাণ্ডারে আরবি শব্দ দেখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, ‘আলজেবরা’ বা ‘বীজগণিত’ আরবি শব্দ ‘আল-জাবর’ থেকে এসেছে। মাল্টিজ বা মাল্টার ভাষা হলো একটি সেমিটিক ভাষা, যা আরবি ভাষার একটি উপভাষা থেকে এসেছে এবং এটি ল্যাটিন বর্ণমালায় লেখা হয়। গ্রীক এবং বুলগেরিয়ানসহ বলকান রাষ্ট্রের ভাষাগুলোও অটোমান তুর্কিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে আরবি ভাষার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শব্দ অর্জন করেছে।

১৭৯৮ সালে আরব বিশ্ব প্রথমবারের মতো পশ্চিমা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের বৃহত্তর যুগে প্রবেশ করে এবং নতুন পশ্চিমা ধারণাগুলো প্রবাহের জন্য আরবি ভাষাকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আধুনিকায়ন করার প্রয়োজনিয়তা অনুভব করে। ফলশ্রুতিতে আরবি ভাষার আঞ্চলিক একাডেমিগুলো ভাষার একটি সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করে। সংস্কার প্রক্রিয়াটি প্রধানত ভাষার শব্দভান্ডার সম্প্রসারণ এবং ভাষাকে আধুনিক করা নিয়ে ব্যাপক কাজ করে। সংস্কার প্রক্রিয়ার পর আরবি ভাষা আধুনিক স্ট্যান্ডার্ড আরবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।

বিশ্বজুড়ে আরবি ভাষা অন্যান্য অনেক ভাষাকে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে মুসলিম সংস্কৃতি এবং মুসলিমরা যেসব দেশ জয় করেছিল সেগুলোর ভাষাকে। সর্বাধিক প্রভাবিত ভাষার মধ্যে কয়েকটি হলো ফার্সি, তুর্কি, হিন্দি, উর্দু, কাশ্মীরি, কুর্দি, বসনিয়ান, কাজাখ, বাংলা, মালয় (ইন্দোনেশিয়ান এবং মালয়েশিয়ান), মালদ্বীপ, পশতু, পাঞ্জাবি, আলবেনিয়ান, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজানীয়, সিসিলিয়ান, স্প্যানিশ, গ্রীক, বুলগেরিয়ান, তাগালগ, সিন্ধি, ওড়িয়া, হিব্রু, হাউসা, এবং আফ্রিকার কিছু কিছু ভাষা, যেমন: সোয়াহিলি, সোমালি। বিপরীতে, অন্যান্য ভাষা থেকেও আরবি ভাষায় শব্দ এসেছে, যার মধ্যে রয়েছে আরামাইক, হিব্রু, ল্যাটিন, গ্রীক, ফার্সি এবং কিছুটা তুর্কি (উসমানী সাম্রাজ্যের কারণে), ইংরেজি এবং ফরাসি (লেভান্টে তাদের উপনিবেশের কারণে) এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- আবিসিনিয়ান।

আরবি বর্ণমালা লেখা হয় ডান দিক থেকে বাম দিকে। এই বর্ণমালাগুলো নাবাতিয়ানের মাধ্যমে আরামাইক থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সাধারণ লেখার পাশাপাশি আরবি বর্ণমালার অনেকগুলো লিখনশৈলী বিকশিত হয়েছিল।

এদের মধ্যে অন্যতম ও সুন্দর একটি লিখন পদ্ধতি হলো আরবি ক্যালিগ্রাফি। পবিত্র কুরআন ও অন্যান্য বই লেখার জন্য, এবং মসজিদ, মাজার বা ইসলামের স্মৃতিসৌধের শিলালিপিগুলোর সজ্জা হিসেবে আরবি ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার দেখা যায়। এই ক্যালিগ্রাফিগুলো কুরআনের একটি আয়াত বা একটি হাদিস বা আরবিতে লেখা যেকোনো বিমূর্ত আর্ট বা শৈল্পিক নকশা হতে পারে।

ক্যালিগ্রাফিগুলো বেশ মনোমুগ্ধকর হয় বলে বিভিন্ন ডিজাইন হিসেবে এগুলোর ব্যবহার চোখে পড়ে। সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে এসব ক্যালিগ্রাফির বিশ্বজোড়া ব্যাপক কদর রয়েছে।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

আরবি ভাষার উৎস, জন্ম ও ক্রমবিকাশ- এম এ এস ইমন

আরবি নামটি শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে আসে এটি পবিত্র কুরআনের ভাষা, যা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পর্কিত। সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রতিদিন তাদের প্রার্থনায় আরবি ভাষায় কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে থাকেন।

এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আরবি ভাষা মুসলমানদের কাছে একটি অতি পবিত্র ভাষা হিসেবে গণ্য।সর্বশেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাতৃভাষা ছিল আরবি, আর আল্লাহ জিব্রাইলের (আ.) মাধ্যমে তার উপর এই ভাষায় ওহী নাযিল করতেন।

ঐতিহাসিকভাবে মুসলিমদের বিশ্বাসমতে, আরবিই সেই ভাষা যার মাধ্যমে জান্নাত বা স্বর্গে মানুষ একে অন্যের সাথে বা ফেরেশতাদের সাথে যোগাযোগ করবে।

আরবি হলো বিশ্বের বহুল ব্যবহৃত কথ্য ভাষাগুলোর মধ্যে একটি। ব্যবহারের দিক থেকে এটি পঞ্চম স্থানে, যা আজকের মধ্যপ্রাচ্য ও

উত্তর আফ্রিকা জুড়ে একটি সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। এমনকি এর ব্যবহার বিভিন্ন উপভাষাতেও রয়েছে। উপরেই বলা হয়েছে, আরবি ভাষা মুসলিমদেরর কাছে একটি ধর্মীয় ভাষা হিসেবেও কাজ করে।

কারণ, আরবি হলো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষা, এবং এটি ইসলাম ধর্মের সাথে সরাসরি যুক্ত। এভাবে এই ভাষা ধর্মীয় তাৎপর্যের সাথে সাথে ঐশ্বরিক উদ্ঘাটনের সাথেও যুক্ত, যা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

জনপ্রিয় এই আরবি ভাষা কোথা থেকে এসেছে? এর জন্ম কীভাবে হলো? আর, কীভাবেই বা এর পরিবর্তন ঘটেছে? প্রাচীন এই ভাষা সম্পর্কে জানাতেই আজকের এই লেখা। পাঠকবৃন্দ, তো চলুন আরবি ভাষা সম্পর্কে জানতে ঘুরে আসি ইতিহাসের পাতা থেকে।

আজকের বিষয় হলো আরবি ভাষা, যাকে আরবিতে ‘আল আরাবিয়া’ বলা হয়। প্রায় ২৯৩ মিলিয়ন স্থানীয় ভাষা ব্যবহারকারী, এবং বিশ্বব্যাপী মোট ৪২২ মিলিয়ন মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলেন। বিশ্বের ২৬টি দেশের অফিসিয়াল ভাষা আরবি। এটি জাতিসংঘের ছয়টি অফিসিয়াল ভাষার মধ্যে একটি।

কুরআনের ভাষা হিসেবে এটি সারা বিশ্বের ১.৭ বিলিয়ন মুসলমানের ধর্মীয় ভাষাও। যদিও তাদের অধিকাংশই আরবি ভাষায় মনের ভাব আদান-প্রদান পারে না, কিন্তু প্রার্থনা এবং ধর্মীয় অধ্যয়নের জন্য আরবি ভাষা সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তাদের অধিকাংশেরই রয়েছে। এই ভাষার রয়েছে বিভিন্ন বৈচিত্র্য।

প্রধান বৈচিত্র্যগুলোর মধ্যে একটি হলো কুরআনের শাস্ত্রীয় আরবি। অনেক পণ্ডিত একে আরবি ভাষার সবচেয়ে নিখুঁত রূপ বলে মনে করেন, এবং কেউ কেউ বলেন যে, এটি একমাত্র সত্যিকারের আরবি, কারণ এটাই ছিল সেই ভাষা যে ভাষায় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ শেষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কাছে কুরআন অবতীর্ণ করেন। তারপর রয়েছে মডার্ন স্ট্যান্ডার্ড আরবি, যা আজ অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত আরবি ভাষার একটি রূপ।

এটি সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবির আধুনিক রূপ, যা কুরআনের ধ্রুপদী আরবির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটা ঠিক শাস্ত্রীয় আরবির মতো নয়, কিন্তু উভয়কেই আরবরা ‘আল-ফুশা’ বলে উল্লেখ করেছে, যার অর্থ ‘বাকপটু বক্তৃতা’।

সেমিটিক ভাষার উপগোষ্ঠীর সর্বোত্তম শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে ভাষাবিদদের মধ্যে এখনও ভিন্নমত দেখা যায়। সেমিটিক ভাষাগুলো প্রোটো-সেমিটিক এবং মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার উদ্ভবের মধ্যে, বিশেষত ব্যাকরণে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে বলে তারা মনে করেন।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়- আরবি ভাষা সেমিটিক ভাষা পরিবার থেকে এসেছে, এবং এটি ঐ পরিবারের অন্যান্য সেমিটিক ভাষার সাথে বিকশিত হয়েছে। সেই দিক থেকে বিশেষ করে আরবি ভাষা মূলত কোনো নির্দিষ্ট ভাষা কোথা থেকে এসেছে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন, কারণ ভাষা সর্বদা পরিবর্তিত এবং বিকশিত হয়।

আরবি এবং অন্যান্য সেমিটিক ভাষা, যেমন- হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় সব একই প্রোটো-সেমিটিক ভাষা থেকে বিকশিত হয়েছে। আরবি ভাষা মূল বা সেন্ট্রাল সেমিটিক শাখার অন্তর্গত একটি ভাষা, যেখানে সেন্ট্রাল সেমিটিকের আরেকটি শাখা থেকে হিব্রু, আরামাইক এবং ফিনিশিয় ভাষাগুলো এসেছে। সেমিটিয় গোত্রের ভাষাসমূহের অন্তর্গত জীবিত সেমিটিক ভাষাগুলো হলো আধুনিক হিব্রু ভাষা (ইসরায়েলের ভাষা), আমহারীয় (ইথিওপিয়ার ভাষা), এবং ইথিওপিয়ায় প্রচলিত অন্যান্য ভাষা। মৃত সেমিটিয় ভাষাগুলোর মধ্যে আছে প্রাচীন হিব্রু, আক্কাদীয় (ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয়), সিরীয় ও ইথিওপীয় ভাষা।

বহু আরব বিশেষজ্ঞ আরবি ভাষার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে আল ক্বালবি তার লিখিত কিতাব আল-আসাম বইয়ে লিখেছেন, ব্যাবিলন থেকে আসা আমালিয়ার জায়ান্টরাই প্রথম আরবিতে কথা বলতেন, এবং তাদের সাথে এটি আরব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেন।

এছাড়া একটি জনপ্রিয় ও ব্যাপক গৃহীত তত্ত্ব ও ধারণা হলো- আরবি ভাষা দক্ষিণ আরব ও আধুনিক ইয়েমেনের আশেপাশে উদ্ভূত হয়েছে, এবং পরে এটি উত্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। পাঠক, চলুন দেখে আসি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষা পরিবার থেকে আরবি ভাষা কীভাবে এলো তার একটি সম্ভাব্য প্রবাহ চিত্র।

প্রাচীনকালে আরবের অধিবাসীরা বিভিন্ন সেমিটিক ভাষায় কথা বলত। দক্ষিণ-পশ্চিমে, প্রাচীন দক্ষিণ আরব পরিবারের (যেমন- দক্ষিণ থামুডিক) অন্তর্গত এবং এর বাইরের বিভিন্ন সেন্ট্রাল সেমিটিক ভাষার ব্যবহার ছিল।

বিশ্বাস করা হয়, আধুনিক দক্ষিণ আরবীয় ভাষার (নন-সেন্ট্রাল

সেমিটিক ভাষা) পূর্বপুরুষরাও এই সময়ে দক্ষিণ আরবের ভাষায় কথা বলত। উত্তরে, উত্তর হিজাজের মরূদ্যানে, দাদানিটিক এবং তায়মানিটিক শিলালিপির ভাষাগুলোর কিছুটা প্রতিপত্তি ছিল। নজদ এবং পশ্চিম আরবের কিছু অংশে ‘থামুডিক সি’ নামে শিলালিপিতে প্রাপ্ত একটি ভাষা পণ্ডিতরা খুঁজে পেয়েছেন।

পূর্ব আরবে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি থেকে হাসাইটিক নামে পরিচিত একটি ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া, আরবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, থামুডিক বি, থামুডিক ডি, সাফাইটিক এবং হিসমাইক নামে পণ্ডিতরা চারটি বিভিন্ন ভাষা পেয়েছেন। ভাষাপণ্ডিতদের প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, সাফাইটিক এবং হিসমাইক প্রকৃতপক্ষে আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং সেগুলোকে পুরনো আরবি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

আরবি সম্পর্কিত অসংখ্য সেমিটিক ভাষা ত্রয়োদশ এবং দশম শতাব্দীর মধ্যে আরবে ব্যবহার হতো। কিন্তু এগুলোর এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা তাদের আরবি ভাষা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। ‘আরব’ হিসেবে উল্লেখ করা লোকদের প্রাচীনতম প্রমাণ খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর একটি অ্যাসিরিয়ান শিলালিপিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এতে শুধু আরবদের কথা বলা হয়েছে। এটি তাদের ভাষার কোনো প্রমাণ দেয় না।

খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টাব্দ ৪র্থ শতাব্দীর মাঝে এমন কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে যা আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপের প্রমাণ দেয়। এই শিলালিপিগুলোর মধ্যে কিছু আরবি ভাষার প্রাথমিক রূপ এবং অন্যগুলো আরামাইক ভাষায় লেখা, তবে এতে আরবির কিছু প্রভাব দেখা যায়। এই শিলালিপিগুলোতে বেশিরভাগই সাধারণ নাম, তাই এটাও আমাদের আরবি ভাষা সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য দেয় না।

আরবি ভাষার সম্ভাব্য প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন মনে করা হয় জর্ডানের বায়ির এলাকায় প্রাপ্ত খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমদিকের একটি শিলালিপিকে। অবশ্য এর ভাষা আরবি না অন্য কোনো সেমিটিক ভাষা তা সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। তবে, প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধের দিককার বহু শিলালিপি পাওয়া গেছে সিরিয়া, জর্ডান ও উত্তর পশ্চিম সৌদি আরবে। মূলত এই লিপিগুলোর উপর ভিত্তি করে এগুলোকে একটি উত্তরের শাখা (সাফাইটিক) ও একটি দক্ষিণের শাখায় (হিসমাইক) ভাগ করা হয়। এগুলোতে ব্যবহৃত লিপি পরবর্তীকালের আরবি লিপি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও তৎকালীন দক্ষিণ

আরবে প্রচলিত লিপি থেকে উৎপন্ন।

কিন্তু লিপি আলাদা হলেও এই লেখাগুলোর ভাষা বিবেচনা করে এগুলোকে আরবি ভাষারই প্রাচীন রূপ বলে নির্ণয় করেছেন ভাষাবিদরা। ঠিক একই সময়ে আরব উপদ্বীপের অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য লিপিতেও সেমিটিক ভাষায় আরও লেখা পাওয়া গেছে, কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই পরবর্তী কালের আরবি ভাষার পূর্বসূরী ছিল না বলে মনে করেন পণ্ডিতরা। সেই হিসেবে দেখলে উত্তর-পশ্চিম আরব ও দক্ষিণ শাম (লেভান্ট বা Levant)-এ আরবি ভাষার প্রথম সহস্রাব্দের পূর্বপুরুষের দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

আরব ভূমিতে প্রধান রাজ্যগুলোর একটি ছিল নাবাতিয়ান রাজ্য। তাদের রাজধানী ছিল জর্ডানের পেট্রা নগরীতে, যা উত্তর আরবে অবস্থিত। তবে মজার ব্যাপার হলো, নাবাতিয়ান মানুষরা তখন আরবি ভাষা লিখত না। তাদের বাণিজ্যব্যবস্থা ছিল অন্যান্য দূরের রাজ্যগুলোতে।

তাই যোগাযোগের জন্য ব্যবহার হতো সেই সময়ের মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান ভাষা আরামাইক। তবে স্থানীয় অধিবাসীরা মোটামুটি নিশ্চিতভাবেই প্রাচীন আরবি ভাষায় কথা বলতেন। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাবাতিয়ানদের মধ্যে প্রথম আরামাইক লিপির একটা টানা হাতের রূপভেদে আরবি ভাষা লিখতে দেখা গেল, যা আইন আভদাত (Ein Avdat) শিলালিপিতে দেখা যায়।

এটিই প্রাচীনতম শিলালিপি, যেটি নিঃসন্দেহে আরবি ভাষার, যার সময় প্রায় ১২৫ খ্রিষ্টাব্দ। পাঠক, আপনারা নিচে যে ছবিটি দেখতে পারছেন, সেটিই আইন আভদাত শিলালিপি, যা বর্তমান ইসরাইলের দক্ষিণে নেগেভ মরুভূমির একটি গিরিপথ ‘আইন আভদাত’-এ পাওয়া গেছে। এটি একটি আরামাইক শিলালিপি, তবে এতে আরবি ভাষার তিনটি লাইন রয়েছে।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

আদম (আঃ)- এম.এ.এস ইমন (পর্ব ২)

যখন আল্লাহর সরাসরি আদেশ অমান্য করেছিল সে আল্লাহকেই দোষারপ করেছিল (নাউযুবিল্লাহ) সে বলেছিল নিশ্চয়ই আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, অতএব আমি মানুষকে পথভ্রষ্ট করব। অন্যদিকে আদম আলাইহিস সালাম নিজের ভুলের দায়ভার পুরোপুরি নিজের কাঁধে নিয়ে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ যদি তাকে ক্ষমা না করেন তার আর কোন আশা থাকবে না তার আর কোন উপায় থাকবেনা এবং আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম ও মা হওয়ার দোয়া কবুল করলেন কিন্তু তাদেরকে এও আদেশ করলেন যেহেতু তারা সেই গাছের ফল খেয়ে ছিল তাই তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীতে কাটাতে হবে।

মুসলিম শরীফের হাদীসে এসেছে আল্লাহ তা’আলা আদম আলাইহিস সালামকে শুক্রবারে সৃষ্টি করেছেন, তাকে শুক্রবারে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, আর শুক্রবারেই তাকে সেখান থেকে বের হয়ে যেতে হয়েছিল।

আদম আলাইহিস সালাম আর মা হাওয়া পৃথিবীর দুটি আলাদা স্থানে অবতীর্ণ হলেন, তাঁরা ঠিক কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে, তবে সব বর্ণনাই যা আসে তা হলো তারা দুজন পৃথক পৃথক জায়গায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জান্নাতের মতো জায়গায় একে অপরের মধুর সঙ্গ পাওয়ার পর দুনিয়ার মতো জায়গায় এসে নিঃসঙ্গ দিন কাটানো অনেক বড় একটা পরীক্ষা ছিল।

একবার ভেবে দেখুন আপনার জীবন সঙ্গী যাকে আপনি সবসময় কাছে পাচ্ছেন, ঘরে ফিরলেই যার দেখা হয় যাকে ঘিরে আপনার সব পরিকল্পনা। তাকে যদি হঠাৎ করে আপনি হারিয়ে ফেলেন এবং কতদিনের জন্য আপনি হারিয়ে ফেলেছেন আপনি জানেন না এবং আপনি যেই রবের কাছে দোয়া করছেন আপনার ভয় হচ্ছে, সেই রব আপনার উপর রেগে আছেন।

আপনি এমন একটি জায়গায় আছেন যা অন্ধকার যা ভয়ানক এবং আপনি জানেন না আপনার জীবনসঙ্গী কেমন জায়গায় আছেন। এমন অবস্থায় নিজেকে কতটা অসহায় মনে হবে তারা ব্যাকুল হয়ে একে অপরকে খুঁজতে লাগলেন, খুঁজতে খুঁজতে কতদিন হয়ে গেল তার কোনো নির্দিষ্ট হিসেব নেই। কিন্তু অবশেষে তারা একে অপরকে খুঁজে পেলেন এবং মা হওয়া এবং আদম আলাইহিস সালাম তাদের দুনিয়ার জীবনের সংসার শুরু করলেন।

বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে প্রায় এক হাজার বছর বেঁচে ছিলেন এবং এই সময়ে মা হওয়া অনেকবার মা হয়েছিলেন এবং প্রতিবার তার কোলে আল্লাহর হুকুমে যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল এবং সেই সময়ের বিধান ছিল এক কোলের সন্তানকে আরেক কোলের সন্তানের সাথে বিয়ে করতে হবে।

অর্থাৎ যেহেতু তখন প্রতিটি মানুষই সরাসরি একে অপরের ভাইবোন ছিল তখন ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে করার নিষেধাজ্ঞা জমজ ভাই বোনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আদম আলাইহিস সালামের প্রথম পুত্র সন্তানের নাম ছিল এবং এরপর এর পুত্র সন্তানের নাম ছিল হাবিল। কাবিল ছিল কৃষক আর হাবিল পশুপাখি পালত। কাবিল ছিল কিছুটা রাগী প্রকৃতির এবং সে হাবিলের বোনকে বিয়ে করার ব্যাপারে অসম্মতি জানাল। তার দৃষ্টিতে তার নিজের বোন ছিল আরো বেশি রূপবতী। এই অবস্থায় আদম আলাইহিস সালামের মাধ্যমে ওহী আসল তারা দুই ভাই যেন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করে এবং কোরবানি কবুল হবে তার পছন্দই চূড়ান্ত হবে।

হাবিল তার খামার থেকে সবচেয়ে সুন্দর পশুটি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করল, অন্যদিকে কবিল তার সবচেয়ে খারাপ ফসলটি কোরবানির নিয়তে উঠিয়ে রাখল এবং হাবিলের কোরবানি কবুল করলেন এবং কবিলের কোরবানি কবুল হলো না। এবং হাবিলের আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কবিলের বোনকে বিয়ে করার জন্য সম্মতি জানাল। কিন্তু এতে কবিলের অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ ভরে গেল এবং সে একপর্যায়ে হাবিলকে বলল সে হাবিলকে হত্যা করে ফেলবে।

হাবিল তার ভাইকে বলল তুমি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালেও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়াবো না, কারণ আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং তার কথা শুনে কাবিল আরো ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলো এবং হাবিলকে হত্যা করার জন্য তার গলা চেপে ধরলো কিন্তু তাকে হত্যা করতে পারল না। তখন ইবলিশ তাদের কাছে আসলো এবং হাবিলকে হত্যা করার পদ্ধতি শেখানোর জন্য একটি পশুর মাথায় পাথর দিয়ে পশুটিকে হত্যা করল এবং কবিল একিভাবে একটি পাথর নিয়ে হাবিলের মাথায় আঘাত করলো এবং এভাবেই হাবিল হয়ে গেল মানব ইতিহাসের প্রথম শহীদ হয়ে গেল মানব ইতিহাসের প্রথম হত্যাকারী।

যতক্ষণ পর্যন্ত আদম আলাইহিস সালাম এর কাছে খবর এলো ততক্ষণে তার কর্মের পরিনাম এর কথা চিন্তা করে পালিয়ে গিয়েছে, সে ভাবল তার আর কোনো আশা নেই। আদম আলাইহিস সালাম ও মা হাওয়া তার দুই সন্তানকে এভাবে হারিয়ে বুকের গভীর শোক ধারণ করে তাদের বাকি সন্তানদের

সদুপদেশ দিতে থাকলেন এবং আল্লাহর এবাদত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকলেন। ধীরে ধীরে বহু বছর পার হয়ে গেল এবং তাদের অনেক সন্তান জন্ম হলেও কেউ কেউ বলেন মা হওয়ার ২০ জোড়া যমজ সন্তান হয়েছিল, আবার কেউ কেউ বলেন সে সংখ্যা একশোর বেশী এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই।

তবে তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একজন সন্তান ছিলেন শীষ, যে তার বাবার মতো সমাজের মানুষকে ভাল কাজ করার উপদেশ দিতেন এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতেন। আদম আলাইহিস সালাম যখন অনেক বৃদ্ধ তখন একদিন তিনি ফল খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, বাস্তবে তার জান্নাতের ফলের কথা খুব মনে পড়ছিল এবং তিনি সেই ফলই খেতে চাচ্ছিলেন।

কিন্তু তার সন্তানেরা যখন শুনলো তাদের বাবা ফল খেতে চাচ্ছেন তারা দ্রুত বেরিয়ে পড়ল সেই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ফল নিয়ে আসার জন্য। তারা যখন ফলের সন্ধানে জঙ্গলে গেল তখন সেখানে তাদের কিছু ফেরেশতাদের সাথে দেখা হয় সেই ফেরেশতারা বলল তোমাদের বাবা যে ফল চেয়েছেন তা এখানে নেই, তোমরা বরং তার কাছে ফিরে যাও এবং আমরাও তার সাথে সাক্ষাৎ করব।

আদম আলাইহিস সালামের সন্তানেরা যখন সেই ফেরেশতাদের নিয়ে বাড়ী ফিরল তখন সেই ফেরেশতাদের একজন কে চিনতে পারলো। কারণ সেই ফেরেশতা এর আগেও একবার দেখা দিয়েছিল যখন তার ছেলেকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি বুঝতে পারলেন মালাকুল মাওত তার স্বামীর আত্মাকে নিতে এসেছে। জান্নাতে বহু বছর সুখে শান্তিতে কাটানোর পর যখন তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল তখন যে
সময়টা মা হাওয়া আদম আলাইহিস সালামকে ছাড়া একাকী কাটিয়েছিলেন সেই কষ্টকর সময়ের কথা তার মনে পড়ে গেল, এবং তিনি মালাকুল মাওতকে বাধা দিলেন।

কিন্তু আদম আলাইহিস সালাম মা হাওয়াকে বুঝিয়ে বললেন তাকে তার রবের কাছে ফিরে যেতে হবে। অবশেষে মা হাওয়া সরে দাঁড়ালেন এবং মালাকুল মউত আদম আলাইহিস সালামের আত্মা নিয়ে নিলেন। তারা আদম আলাইহিস সালাম এর মরদেহকে গোসল করালেন দাফন করলেন এবং মাটিতে কবর দিলেন এবং সেই প্রথা আমরা আজ পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছি।

আদম আলাইহিস সালামের মৃত্যুর সময় মানব সমাজ অনেকটাই বড় হয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে ভালো কাজের পাশাপাশি নানা ধরনের পাপ কাজ

বাড়তে লাগল এবং এই অবস্থায় আল্লাহর বাণী প্রচার করার কাজে নামলেন আদম আলাইহিস সালামের সন্তান শীষ আলাইহিস সালাম।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

আদম (আঃ)- এম.এ.এস ইমন (পর্ব ১)

প্রথমে আল্লাহ ছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। এমন কোনো মুহূর্ত ছিল না যখন তিনি ছিলেন না। তিনি ব্যতীত কোন বাস্তবতা ছিলনা। কোন এক পর্যায়ে অসীম জ্ঞান এর মালিক সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি সৃষ্টি করবেন।

একে একে সম্ভাবনার জগত থেকে বাস্তবতার জগতে নিয়ে আসতে লাগলেন তাঁর প্রথম সৃষ্টিগুলোকে। যেহেতু অসীম জ্ঞানের মালিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সৃষ্টি বলে কিছু থাকবে, তার মানে সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকাটাই শ্রেয়। সেই সৃষ্টি ভালো কিছুই করুক বা খারাপ কিছু।

আল্লাহ তার আরশ সৃষ্টি করলেন, পানি সৃষ্টি করলেন, কলম সৃষ্টি করলেন, এবং সেই কলমকে আদেশ করলেন লেখ। কলম বলে বসল, আমার রব আমি কি লিখবো? আল্লাহ বললেনঃ সময়ের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সব কিছু লিখো। আরশ শব্দের অর্থ আসন। আসন, পানি, কলম এই শব্দগুলোর অর্থ আমরা জানি। কিন্তু আল্লাহর সেই আরশ, সময়ের শুরু সেই পানি এবং সবকিছুর নিয়তি লেখা সেই কলম কেমন তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, এবং একমাত্র আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মহাবিশ্ব তৈরির ৫০ হাজার বছর আগে আল্লাহর হুকুমে, সেই কলম সবকিছু নিয়তি লিখে রেখেছিল লাওহে মাহফুজে। ৫০ হাজার বছর পর আল্লাহ আসমান এবং যমীন সৃষ্টি করলেন।

অতঃপর কোন এক পর্যায়ে আল্লাহ সৃষ্টি করলেন ফেরেশতাদের, নূর থেকে তৈরি আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর এবাদত নিমজ্জিত থাকে, এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না, এবং তাদের

মধ্যে থেকে সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ নূর থেকে ফেরেশতা তৈরি করার পর আরও কিছু সময় পার হলো এবং এরপর এক নতুন জাতি সৃষ্টি করলেন এবং তাদের সৃষ্টি করলেন এক ধরনের ধোয়াবিহীন আগুন থেকে। এই জাতির নাম হল জীন। ফেরেশতা আর জীনদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, জীন জাতি প্রকৃতিগতভাবেই আল্লাহর ইবাদত করে না বরং তারা চাইলে তার হুকুম অমান্য করতে পারে। আল্লাহ জীনদের দুনিয়াতে খালিফা হিসেবে পাঠালেন। আগুন থেকে তৈরি এই সৃষ্টি ছিল উত্তেজনা প্রবণ, তারা ঘনঘন যুদ্ধও খুনাখুনিতে লিপ্ত হতে লাগল এবং দুনিয়াতে অন্যায়-অনাচার ছড়িয়ে পড়লো। কিছু পুণ্যবান থাকা সত্বেও বেশিরভাগ আল্লাহকে অমান্য করতে লাগলো।

কিন্তু একজন ছিল যে বিশেষভাবে আল্লাহর এবাদত করত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার চেষ্টা করত। এক পর্যায়ে তার এবাদত এর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাকে তার এতটা কাছে আসার অনুমতি দিলেন যে সে ফেরেশতাদের অবস্থানে গিয়ে আল্লাহর এবাদত করার সুযোগ পেলো। অন্যদিকে দুনিয়াতে জীন জাতির অপকর্ম চলতে থাকায় আল্লাহ তা’আলা ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন দুনিয়াতে গিয়ে সেই জীনদের বিতাড়িত করার জন্য। এই দায়িত্ব পালন করার জন্য ফেরেশতাদের সাথে পাঠানো হল আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করা সেই জীনকেও।

দুনিয়ায় অন্যায় অনাচার সৃষ্টিকারীদের ফেরেশতারা ধ্বংস করল এবং খুব অল্পসংখ্যক জীন রেহাই পেল। আল্লাহর হুকুম পালন করে ফেরেশতারা আসমানে ফিরে আসলো এবং তাদের সাথে সেই পুণ্যবান জীন। এরপর কতটুকু সময় পার হল তা আমরা জানিনা। কিন্তু একপর্যায়ে রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিলেন তিনি এক নতুন জীব সৃষ্টি করবেন। যখন আল্লাহ ঘোষণা দিলেন তিনি মানুষ সৃষ্টি করবেন, ফেরেশেতারা অবাক হয়ে যায়। তারা দেখেছিল স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন জীন দুনিয়াতে কত অন্যায়-অনাচার করেছিল, তারা জানত মানুষকেও যদি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয় তাহলে তারাও পৃথিবীতে একিরকম অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হবে। তবু কেন আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করবেন। তারা আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপরে প্রশ্ন তুলছিল না বরং তাদের বিস্ময় প্রকাশ করছিল।

আল্লাহ খুব সহজভাবেই বুঝালেন তাঁর কাছে এমন জ্ঞান রয়েছে যা ফেরেশতাদের কাছে নেই, অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করার পর তারা দুনিয়াতে নানা অপকর্মে লিপ্ত হলেও তাদের সৃষ্টি করার পিছনে কারণ রয়েছে, এবং শিঘ্রই সেই কারনগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ নিজ হাতে আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করলেন, এবং তাকে সৃষ্টি করলেন মাটি থেকে এবং তার দৈহিক গঠন সম্পন্ন করার পর তাঁর

ভেতর রূহ বা আত্মা ফুকে দিলেন। এবং তিনি (আল্লাহ) আদম আলাইহিস সালাম কে সবকিছুর নাম শিখালেন, এবং তিনি ফেরেশতাদের হুকুম দিলেন আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করার জন্য, ফেরেশতাদের আসনে তখন সেই পুণ্যবান জিনেরও জায়গা ছিল। সেই আদেশটি তার ওপরেও প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু প্রতিটি ফেরেশতা তাৎক্ষণিকভাবে আদম আলাইহিস সালামকে সম্মান স্বরূপ সেজদা করলেও, সেই জিন তাকে সেজদা করল না। প্রথমবারের মতো কেউ স্বয়ং আল্লাহর উপস্থিতিতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখালো, এবং সাথে সাথে তারা এতো বছরের ইবাদতের উদ্দেশ্যে প্রকাশ পেল। সে আল্লাহকে বেশি বেশি ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা কামনা করেনি, কামনা করেছিল মর্যাদা সম্মান।

আগুনের তৈরী হয়ে ইবাদতের মাধ্যমে নূরের তৈরী ফেরেশতাদের মধ্যে জায়গা করে সে এতটা অহংকারী হয়ে গিয়েছিল, যে সে মাটির তৈরি আদম আলাইহিস সালামকে তাকে ছোট করে দেখলো। সে যে গোটা মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান রব্বুল আলামীনের অমান্য করার মাধ্যমে সবচেয়ে অপদস্ত অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিল তা বুঝতে পারল না, এবং হয়ত আল্লাহকে অমান্য করার চেয়েও বড় ভুলটা সে তার পরে করল। সে আল্লাহর রহমত এবং অনুগ্রহের ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেল, সে ধরে নিল সে যে ভুল করেছে এর থেকে আল্লাহ তাকে আর কোনদিন ক্ষমা করবেন না। এই হতাশ হয়ে যাওয়াকে আরবিতে বলা হয় আবলাসা, এবং সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল ইবলিশ। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা ইবলিসকে বিতাড়িত করলেন।

ইবলিসের মনে এত প্রবল হিংসা আর ক্রোধ জন্ম নিল, যে সেই অভিশাপের মুহূর্তেও আল্লাহর কাছে দোয়া করে ফেলল। কিন্তু সে মাগফেরাতের জন্য দোয়া করল না, বরং আল্লাহর কাছ থেকে কিছু সময় রেহাই চাইলো, যেন সে আল্লাহর কাছে প্রমাণ করতে পারে মানব জাতি কতটা খারাপ। এবং মহান রব্বুল আলামীন এত বেশি দয়াশীল তাঁর সৃষ্টিকে তিনি এতটাই ভালোবাসেন যে, তার সরাসরি হুকুম অমান্য করার পর যখন তার কাছেই দোয়া করল, তিনি তার দোয়া কবুল করে নিলেন।

তাহলে আমরা যখন ভুল করে ফেলি বারবার একই গোনায় লিপ্ত হতে থাকি, এবং এরপর মনে করি আমরা অনেক বেশি খারাপ হয়ে গেছি আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন না। আমাদেরকে এমন চিন্তা করার কোনো কারণ রয়েছে।

আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন, এবং তিনি সেখানে তার রবের নেয়ামত উপভোগ করতে লাগলেন, এবং ইবলিশ গোপনে তাকে ধোঁকা দেয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলো।

সংকলনেঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, দৈনিক ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’

মেহেরপুরে সর্বনিম্ন ফিতরা ১০০ টাকা, সর্বোচ্চ ৩৩০০ টাকা

বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ফিতরা ও যাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ মার্চ) দুপুর দুইটার দিকে মেহেরপুর হোটেল বাজার জামে মসজিদে এক আলোচনা সভার মাধ্যমে এই নিসাব নির্ধারণ করা হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মো. আব্দুল ওহাব, দপ্তর সম্পাদক মাওলানা জামাল উদ্দীন, সহ-দপ্তর সম্পাদক মাওলানা ইদ্রিস আলী, সদস্য মাওলানা সাইফুল ইসলাম এবং উপদেষ্টা মাওলানা সিদ্দিকুর রহমানসহ অন্যান্য মুসল্লিগণ।

সভায় ফিতরার হার নির্ধারণ করা হয় সর্বনিম্ন ১০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৩৩০০ টাকা জনপ্রতি।

এছাড়া, যাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়। সমস্ত ব্যক্তিগত খরচ বাদ দিয়ে সর্বনিম্ন ৮০,৩৭৫ টাকা সঞ্চিত থাকলে, সেই টাকার আড়াই শতাংশ (২.৫%) হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

মেহেরপুরে মেরাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভা

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মেরাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য” শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহমুদ।

স্বাগত বক্তব্য দেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার ওবাইদুর রহমান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মডেল মসজিদের ইমাম মুফতী মোঃ সাদিকুর রহমান। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাস্টার ট্রেইনার মাওলানা মোঃ আব্দুল হামিদ।
আলোচনা সভার সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহিদুল ইসলাম।

উক্ত আলোচনা সভায় বক্তারা মেরাজের ধর্মীয় গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং ইসলামের শাশ্বত শিক্ষাগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

যুব সমাজের উদ্যোগে তাফসীরুল কুরআন মাহফিল

মেহেরপুরে আশরাফপুর যুব সমাজের উদ্যোগে তাফসীরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার সন্ধ্যা আটটার দিকে আশরাফপুর যুব সমাজের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজনে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়নে আশরাফপুর ফুটবল খেলার মাঠ প্রাঙ্গনে তাফসীরুল কুরআন মাহফিল আয়োজন করা হয়।

আশরাফপুর যুব সমাজের উদ্যোগে তাফসীরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠানে আশরাফপুর বায়তুন নূর জামে মসজিদের সভাপতি মোঃ নাজাত আলী সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী আলোচক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় কেরাত প্রতিযোগিতা পুরস্কারপ্রাপ্ত হযরত মাওলানা ক্বারী এম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, (ঢাকা)

দ্বিতীয় বক্তা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবীদ মুফাসসিরে হাফেজ মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, বিশেষ বক্তা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবীদ হযরত মাওলানা মোঃ ইসমাইল হোসেইন, আশরাফপুর যুব সমাজের উদ্যোগে তাফসীরুল কুরআন মাহফিল অনুষ্ঠানের সহযোগিতা আশরাফপুর গ্রামবাসী।

ঝিনাইদহে ফুরফুরা শরীফের পীর ন’হুজুর কেবলার ওফাত দিবস পালিত

ফুরফুরা শরীফের পীর এ কামেল, মাদারজাদ ওলি, গাওসুল ওয়াক্ত হজরত মওলানা শাহ সুফী নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী ন’হুজুর পীর কেবলা (রহঃ) এঁর ৪৪তম ওফাত দিবস গতকাল মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাব গাম্ভির্য্যের সাথে পালিত হয়।

এ উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহের বিভিন্ন এলাকায় জমিয়তে জাকেরিণের পক্ষ থেকে হতদরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ করা হয়। এছাড়া সন্ধ্যায় ব্যাপারীপাড়া সায়াদাতিয়া খানকাহ শরীফ, ঢাকার ট্রফিক্যাল হাইওয়ে হোমস ও খুলনা শহরে বাকীবিল্লাহ ভবনে সন্ধ্যায় সওয়াব রেসানী, জিকির, মিলাদ ও দোয়ার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মহাফিলে দেশ-জাতির শান্তি কামনা ও বিশে^র নির্যাতিত মুসলিমদের জন্য খাস ভাবে দোয়া করা হয়। ফুরফুরা দরবার শরীফেরও দিবসটি যথাযথ

ভাবে পালিত হয়।

১৯৮২ সালের এই দিনে ন’হুজুর পীর কেবলা নামে পরিচিত ফুরফুরা শরীফের পীর হজরত মাওলানা শাহ সুফী নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী (রহঃ) ভক্ত আশেকানদের কাঁদিয়ে ওফাত প্রাপ্ত হন। দিবসটি পালনে প্রতিবছরই দুই বাংলার ভক্ত আশেকানরা ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহন করে থাকেন। হুজুরের ৪৪তম ওফাত দিবস পালনের প্রাক্কালে ন’হুজুর পীর কেবলার পৌত্র ও জমিয়তে জাকেরিণের মুখ্য নির্দেশক মওলানা মোহাঃ আল্লামা জাবিহ্হুল্লাহ (মাদ্দঃ) সিদ্দিকী দাদা হুজুর কেবলার সিলসিলা আঁকড়ে ধরে তার মত ও পথের উপর মুরীদ ও ভক্ত আশেকানদের কায়েম থাকার আহবান জানান।